বদলে যাওয়া মানুষ বদলে যাওয়া গ্রাম

সোনার চাষ হয় পাইকপাড়ায়। আকুল, মোসাদ্দেক, আমীরুলদের দাবিও তাই। পেঁয়াজ চাষী বদলে দিয়েছে তাদের জীবন। পাল্টে দিয়েছে পাইকাপাড়ার গ্রামের চিত্র। কিন্তু কীভাবে?... সেই কথাই বলেছেন

সাইফুল হাসান

কেমন আছেন?- এই প্রশ্নটির উত্তর এখন আকুলের কাছে ১০ বছর আগে ছিল ঠিক উল্টো। প্রশান্তির হাসি নিয়ে আকুল জবাব দেয়, 'ভালো। আমারে (আমাদের) মতো ভালোই আছি।'

একটি সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়েছে আকুলের জীবন। যে সংসারে কয়েক বছর আগেও হাহাকার লেগেছিল। এখন তা সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। এখন যাদের চিন্তা বছরের হিসাবে কয়েক বছর আগেও তাদের চিন্তা করতে হতো কালকে কীভাবে চলবে?

সম্পত্তি হিসেবে আকুলের বাবার ছিল ১৮ কাঠা জমি। তাতে তো আর জীবন চলে না। ১০ বছর বয়স থেকেই অন্যের বাড়িতে কামলা খাটতে যেতো আকুল। বড় ভাই, বাবা-মা সবাই পরের বাড়িতে কাজ করতো। তারপরও সংসার চলতো না। আকুলের ভাষায়, 'কতদিন যে না খায়ে কেটেছে। ক্ষুধার জ্বালায় মাঝে মাঝে এমন মনে হতো যে চোখের সামনের সব কিছু গিলে ফেলতি ইচ্ছে হতো। কোনো কারণে একদিন কাজ কামোই হলি উপোস। গ্রামের মানুষ কাজ করার জন্য আর কয় টাকা দিতো? সে সব দিনির কথা মনে না করাই ভালো।'

২৬ বছর বয়সী আকুলের জীবনে ২১ বছরের হিসাব এমনই।

এরই মধ্যে সে বিয়ে করে। বিয়ে করে সে জীবনের জন্য। আনন্দের জন্য নয়। আকুল বলেন, 'তিন বাপবেটা পরেত(কামলা) দিয়েও পেট চলছিল না। আমারে চিন্তা ছিলো বিয়ে করার পর তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিতি হবে। বাচ্চাটি যদি ছেলে হয়, তাহলে ১০ বছর পর্যন্ত কষ্ট করলিই ঐ ছাওয়াল মাঠে যাতি পারবি। ফলে সংসারে কাজ করার লোক বাড়বি। তিন বাপবেটা কাজ করার চেয়ে পাঁচজনে মিলে কামলা দিলি বেশি রোজগার।' প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আকুল নেয়নি। খুব সহজে জীবন পরিবর্তন করার কৌশলও তার জানা ছিল না। বিবাহিত জীবনে সে চেয়েছিল একটু স্বাচ্ছন্দ্য।

কোনোভাবেই যখন কিছু হচ্ছিল না তখন আকুল তার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ভয়াবহ একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলে। সংসারে সামান্য কিছু জমানো টাকা ছিল। আকুলের মা দুটো গরু বর্গা পুষতো। গরু দুটো বিক্রি করে দেয় আকুল। জমানো ও গরু বিক্রি করে নগদ পাওয়া যায় ৩০ হাজার টাকা। সঙ্গে কিছু জমি বর্গা নেয় আর বাবার ১৮ কাঠা জমি। সব মিলিয়ে ৪ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগানোর সিদ্ধান্ত হয় আকুলের। ভাগ্য নয়, জীবনকে ফিরিয়ে আনার যুদ্ধে নামে আকুলের পরিবার। সবাই

মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেঁয়াজ চাষে। কঠোর পরিশ্রমে সে বছর ৪ বিঘা জমিতে তারা প্রায় ১৫০ মণ পেঁয়াজ পায়। পেঁয়াজ বিক্রি করে আকুলের আয় হয় লাখ খানেক টাকা। এই টাকা দিয়ে সে হালের দুটো গরু কেনে ও গরুর গাড়ি বানায়। সঙ্গে আরো ১৮ কাঠা জমি কেনে। পেঁয়াজ মাত্র তিন মাসের ফসল। পেঁয়াজ ওঠার পরে বাকি সময় ঐ জমিতে ধান চাষ করে। ধানের ফলন দিয়েই তাদের সারা বছর খাবারের চিন্তা দূর হয়। এভাবেই বদলে যায় আকুলদের জীবন। শুরু হয় নতুন অধ্যায়।

ঐ সময় সম্পর্কে আকুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যে ঝুঁকি আমরা নিছ্লাম তাতে পথে বসে যাতি পারতাম। ঐ বছর কোনো কারণে পেঁয়াজি মার খালি আমাদের যে কি হতো তা চিন্তা করতিও ভয় হয়। কিন্তু আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছিলো বলেই আজ কোনো অভাব নেই। আমরা গ্রামের সফল চাষী।'

পরের বছর তারা কিছু জমি বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা ভিত্তিতে লিজ ও কিছু জমি বর্গা নেয়। সঙ্গে নিজেদের ৩৬ কাঠা জমি। সব মিলিয়ে তারা সে বছর ৫ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে। পেঁয়াজ চাষের পেছনে খরচ হয় ৩৫ হাজার টাকা। এ বছর তারা ২০০ মণ পেঁয়াজ পায়। বিক্রি করে প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় হয়। মাত্র তিন মাসে তাদের লাভ হয় এক লাখ পনেরো হাজার টাকা। এই টাকায় সে কিছু জমি কেনে। এ ভাবেই শুধু পেঁয়াজ চাষ করে তাদের জীবন বদলে যেতে থাকে। পরের বছর সে ৩৫০ মণ পেঁয়াজ পায়। এবার পেঁয়াজ বিক্রি করে সে তিন বিঘা জমি কেনে। সব মিলিয়ে আকুল এখন ৬ বিঘা জমির মালিক। এ বছর তারা প্রায় ৭ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগিয়েছে। এখন পেঁয়াজের জন্য অপেক্ষা। আকুল আশা করছে সব কিছু ঠিক থাকলে তারা আনুমানিক ৫০০ মণ পেঁয়াজ পেতে পারে। বর্তমানে পেঁয়াজের যে বাজার দর তাতে ৫০০ মণ পেঁয়াজের বাজারদর প্রায় ৫ লাখ টাকা হবে। এই টাকা পেলে আকুল আরো ৫ বিঘা জমি কিনবে।

এখন আকুলের অভাব নেই। না খেয়ে থাকার কষ্ট এখন তার পরিবারকে পেতে হয় না। বরং সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েই চলছে বছর বছর। বাড়িতে তিনটি বড় টিনের ঘর হয়েছে। গ্রামের চাষীরা এখন আকুলের বাড়িতে পেঁয়াজের বীজের জন্য ধরনা দেয়। অভাবের জন্য আকুল স্কুলে যেতে পারেনি। যে ছেলেকে সে কামলা খাটাতে চেয়েছিল সে এখন স্কুলে যায়। তার স্বপ্নের মধ্যে এসেছে বিলাসিতা, এসেছে মানসিকতায় পরিবর্তন। আকুলের ইচ্ছা ছেলেকে বড় শিক্ষিত মানুষ বানাবে। এক সময় পরের বাড়িতে কাজ করে আকুলের জীবন চলতো, এখন পেঁয়াজের সিজনে আকুলের বাড়িতে শতাধিক লোক কাজ করে জীবন চালায়। একদিন যে দারিদ্র্য তার জীবনের সব আনন্দ কেড়ে নিতে থাবা তুলেছিল সেই দারিদ্র্যের মুখে চপেটাঘাত করে আকুল এখন অনেকের সামনেই উদাহরণ।

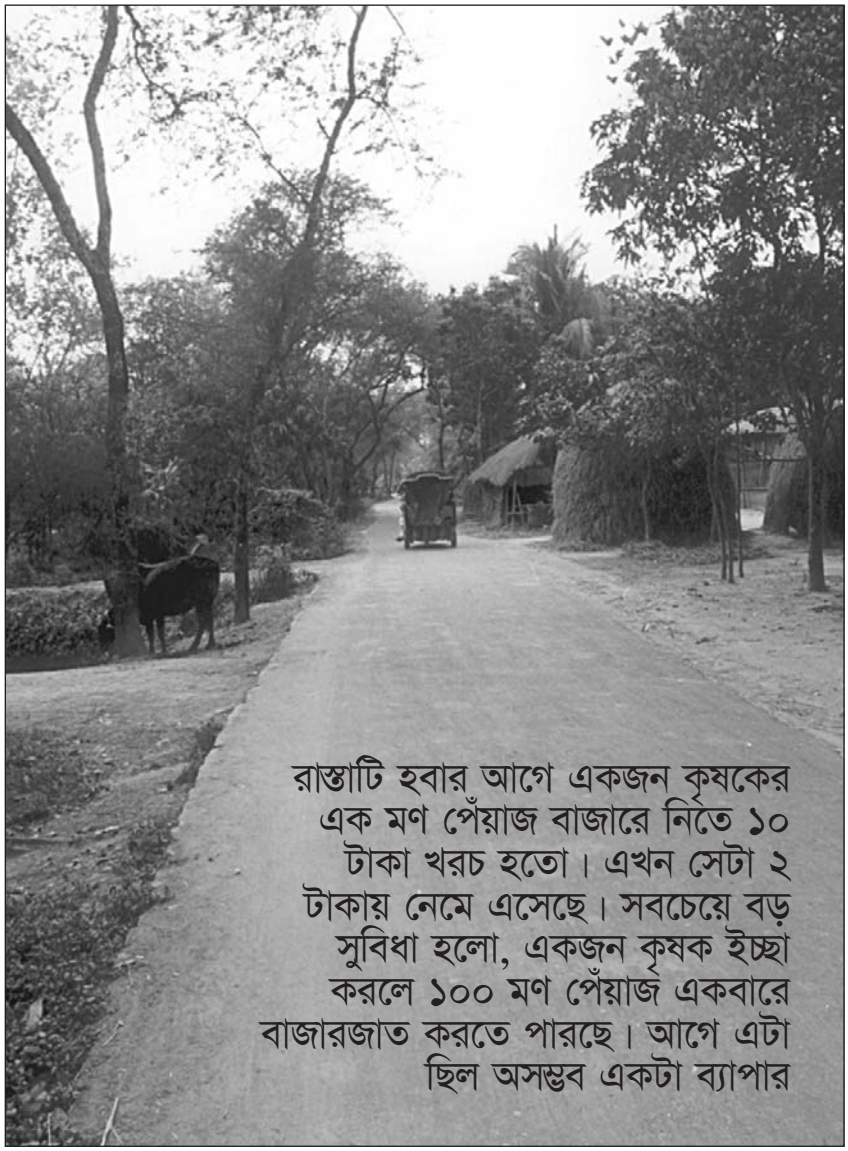

রাস্তাটি হবার আগে একজন কৃষকের এক মণ পেঁয়াজ বাজারে নিতে ১০ টাকা খরচ হতো। এখন সেটা ২ টাকায় নেমে এসেছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, একজন কৃষক ইচ্ছা করলে ১০০ মণ পেঁয়াজ একবারে বাজারজাত করতে পারছে। আগে এটা ছিল অসম্ভব একটা ব্যাপার

আকুল-মোসাদ্দেক একই সূত্রে বাঁধা

আকুল যুবক। মোকাদ্দেস মোল্লা বৃদ্ধ প্রায়। আকুল শুরু করেছিল ৫ বছর আগে। মোকাদ্দেস মোল্লা ১৫ বছর আগে। অন্যান্য অভাবী মানুষের মতোই এক সময় মোকাদ্দেসের জীবন ছিল। জিয়াউর রহমানের খালকাটা কর্মসূচি শুরু হলে সে মাটি কাটার কাজ করতো। মাসে ৩০ কেজি গম পেতো। তাই দিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়ে না খেয়ে জীবন চলতো তার। '৮৫ সালের দিকে তিনি একই গ্রামের আমিরুল নামের একজনের দেখাদেখি পেঁয়াজের বীজের ব্যবসা শুরু করে। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে পেঁয়াজের দানা। পেঁয়াজের বীজ থেকে চারা তৈরি করে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করতে নিয়ে যেতো। প্রথম বছর সে ৩০ কেজি বীজ দিয়ে শুরু করে। বীজ থেকে চারা তৈরি করার প্রক্রিয়া খুবই কষ্টকর। তখন স্যালো মেশিন ছিলো না। ক্যানেল বা খালের ধারে জমি তৈরি করে বীজ বুনতে হতো। তারপর প্রতিদিন ভোরে বাড়ির সবাই মিলে ক্যানেল থেকে কলসি ভরে পানি টেনে বীজ বোনা জমিতে সেচ দিতো। মোকাদ্দেস মোল্লারও এভাবেই শুরু। তখনকার দিনে এক কেজি পেঁয়াজের চারা বিক্রি হতো ১০ থেকে ১৫ টাকায়। মোকাদ্দেস মোল্লা বলেন, 'আমরা যখন শুরু করি তখন তো এতো

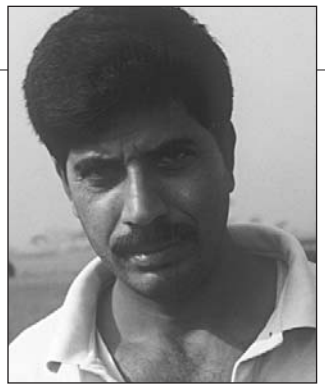

সুবেদ আলী শেখ ও নাসির উদ্দিন বিশ্বাস

সুবিধা ছিলো না। কাঁচা রাস্তার কারণে চারা ঘাড়ে করে, গরুর গাড়িতে করে থানা শহরে নিয়ে যেতে হতো। সেখান থেকে ট্রাকে যশোর, বারোবাজার, কালীগঞ্জ, মাগুরা জেলার বিভিন্ন হাটে। এক কেজি বীজ থেকে যে চারা হতো তা বিক্রি করে কয়েক হাজার টাকা লাভ হতো। কিন্তু বীজ থেকে চারা বানানোর জন্য যে কষ্ট তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। যা হোক এভাবেই শুরু করলাম। এক সময় পেটে ভাত ছিলো না। পেঁয়াজের দানার ব্যবসা শুরু করার পর পেটে ভাত এল, পরনে কাপড়। আল্লাহ আজ আমাকে সব দিয়েছে। স-ও-ব।'

মোকাদ্দেস মোল্লা আজকে প্রতিষ্ঠিত পেঁয়াজ চাষী। চার ভাই-বোনের মধ্যে মোকাদ্দেস সবার বড়। বাবার জমি ছিল না, অর্থও ছিল না। ফলে অভাব তাদের পিছু ছাড়েনি। প্রথম বছর পেঁয়াজের দানার ব্যবসা করে তিনি ১ লাখ টাকা লাভ করেন। সেটা ছিল তার জীবনের সাফল্যের দিন। এ রকম পর পর ৩ বছর পেঁয়াজের দানার ব্যবসা করেন। এরপর শুরু করেন পেঁয়াজ চাষ। শুধু পেঁয়াজের চাষ করে আজ সে ৯ বিঘা জমির মালিক, মাঠে স্যালো মেশিন আছে, হালের গরু আছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। হাতে সব সময় কিছু নগদ টাকাও থাকে।

যে গ্রামের গল্প আমরা করছি, এই গ্রামের মানুষগুলো শুধু পেঁয়াজের চাষ করে তাদের জীবন বদলে ফেলেছে। পাল্টে ফেলেছে জীবনের গতি। একই জমিতে পেঁয়াজের পর ধান বা অন্য ফসল চাষ করা যায় বলে এই গ্রামের লোকজন পেঁয়াজ চাষে উৎসাহিত হচ্ছে। শুধু আকুল, মোসাদ্দেক নয়, এ রকম অনেকের, অনেকের উদাহরণ দেয়া যায় ঐ গ্রাম থেকে। সন্ত্রাস, বন্যাকবলিত বাংলাদেশে এই গ্রামটি একেবারেই ব্যতিক্রম। একেবারেই অন্য রকম। বলা যায়, সফল একটি গ্রাম।

বদলে যাওয়া গ্রাম পাইকপাড়া

এই সফল কৃষকদের বাড়ি পাইকপাড়া গ্রামে। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার প্রত্যন্ত এক গ্রাম পাইকপাড়া। বিদ্যুৎ নেই। একটি নামমাত্র প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা আছে। এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য ৩ কিলোমিটার দূরে হিতামপুর অথবা ৫ কি.মি দূরে শৈলকুপা স্কুলে যায়। শৈলকুপা থানাটি সারা দেশে সন্ত্রাসকবলিত এলাকা বলে পরিচিত। বিশেষত আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির জন্য পরিচিত। সেই শৈলকুপার মানুষই গত ১৫ বছরে কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়ে চলছে । সরকারি-বেসরকারি সাহায্য ছাড়াই তারা এটা করেছে। সরকার

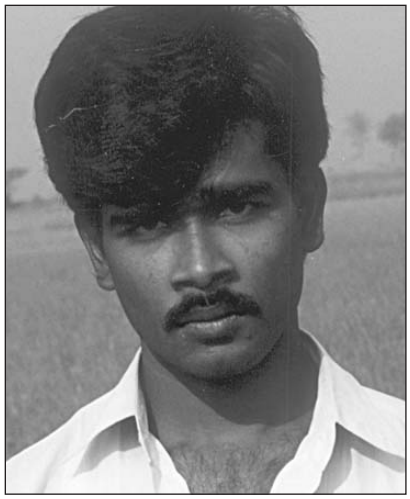

আকুল: শুধু পেঁয়াজ চাষ করে নিজের ভাগ্য বদলে ফেলেছে

পাইকপাড়া গ্রামের কৃষকদের খবর না রাখলেও কীটনাশক কোম্পানির প্রতিনিধিরা খবর রাখেন। যদিও গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ এখনো পর্যন্ত জৈব সারের প্রতি আগ্রহী। হালের বলদের জায়গায় এসেছে স্যালো, ট্রাক্টর।

শুধু পেঁয়াজ চাষ করে পাইকপাড়ায় চাষীরা ১০-১৫ বছরের হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছে সবাই। শিক্ষার হার রয়ে গেছে আগের দারিদ্র্যসীমার নিচে। এই গ্রামে সরকারি বড় চাকরি বলতে বর্তমানে একজন টিএনও এবং অনেক আগে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একজন চাকরি করতেন। আশার কথা হচ্ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে। মানুষ সচেতন হচ্ছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। এই গ্রামের চাষী তারিক বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'পেঁয়াজ আমাদের কাছে সোনার মতো। গ্রামের মানুষ শুধু পেঁয়াজ চাষ করে উঠে গেলো। পেঁয়াজের চাষ মাত্র ৩ মাসের। বাকিটা সময় যা ইচ্ছা চাষ করা যায়। শুধু পেঁয়াজের চাষ থেকে যা আসে তা দিয়েই আমাদের বছর চলে যায়। আরেকটা ব্যাপার হলো, আমাদের পেঁয়াজের মান খুবই ভালো। সরকারের কৃষি কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ হেদায়েতুল্লাহও স্বীকার করলেন এই গ্রামের কথা। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি এখানে এসেছি ১০ মাস। পাইকপাড়ার কথা শুনেছি। গ্রামটি অসম্ভব সম্ভাবনাময়। পাইকপাড়ার মতো গ্রামকে কৃষি বিভাগ সব সময় আলাদা গুরুত্ব দেয়। আমার জানা মতে, এই গ্রামের লোক ভীষণ পরিশ্রমী এবং পরিশ্রম করে তারা যে ফসল ফলায় তার কোয়ালিটি খুব ভালো।'

পাইকপাড়াবাসী শুধু নিজেদের চেষ্টায় বদলে ফেলেছে নিজেদের জীবন। জীবন বদলে দেয়ার সেই সোনার হরিণটির নাম 'পেঁয়াজ'। অবশ্য পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রমের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অধিবাসীদের মোট জমির পরিমাণ প্রায় দু'হাজার বিঘা। এর মধ্যে প্রায় ১৮-১৯ শত বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। সরকারের কৃষি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী এ বছর বীজ সংকটের কারণে পুরো শৈলকুপায় পেঁয়াজ চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ বছর এই থানায় ১২৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৩৮ হেক্টর জমি পাইকপাড়ার চাষীদের। কৃষি অফিসার মুন্সি মোঃ হেদায়েতুল্লাহ বলেন, 'সারা দেশেই কৃষিতে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। দেশের এই চিত্র পত্র-পত্রিকাগুলোতে অনুপস্থিত। এটা দেখার চোখ থাকতে হবে। শুধু এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য যে কেউ পাইকপাড়া গ্রামে এলেই বুঝতে পারবে আমাদের গ্রামগুলোতে কি বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। পাইকপাড়া একটি মডেল গ্রাম হতে পারে।'

পাইকপাড়া গ্রামে শিক্ষার কোনো অগ্রগতি না থাকলেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক মুক্তির ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভালো এবং শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। খসড়া এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি বছর এই গ্রামে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হয় তার বাজার মূল্য কোটি কোটি টাকা। প্রচুর পেঁয়াজ উৎপাদন হলেও এর সংরক্ষণে অনেক সমস্যা রয়েছে। গত ১৫ বছরে গ্রামটি অনেক বদলালেও মজার একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সেটি হলো আগে মানুষের হাতে পয়সা ছিলো না বলে তাদের ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আর এখন এই গ্রামের মানুষ পেঁয়াজের সিজনে লাখ লাখ নগদ টাকা লেনদেন করে, তারপরও ব্যাংকের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ খুব কম। কারণ হিসেবে আকুল বলেন, 'যা টাকা পায় তা দিয়ে জমি কিনে ফেলি। আমরা চাষা মানুষ। মাটি আমাদের বাপ-মা। তাই যত টাকা হয় তত মাটি কিনি।'

পাইকপাড়ায় আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। জমিসহ সব কিছু আগে গ্রামের মাত্র ৭টি পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতো। অর্থাৎ গ্রামের সব কর্মকান্ড ৭টি পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। এখন এই ৭টি পরিবারের অবস্থা পড়তির দিকে। কারণ এই পরিবারগুলোর হাতে জমি থাকলেও তারা সরাসরি কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ নিজেরা রাত-দিন পরিশ্রম করে জমির মালিক হচ্ছে, হচ্ছে সম্পদশালী। মোটা দাগে বলতে হয়, পাইকপাড়া গ্রাম তার সামন্তবাদী চরিত্র হারিয়ে প্রায় সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পথিকৃৎ আমিরুল ইসলাম

পাইকপাড়া বদলে যাবার পেছনে রয়েছেন একজন মানুষ। শুধু পাইকপাড়া নয়, আরও অনেক গ্রাম এই মানুষটির জন্য বদলে যাবার পথে। এই মানুষটির নাম আমিরুল ইসলাম। তার কারণেই পাইকপাড়ার সব মানুষ আজ অন্য মানুষ। আমিরুল ইসলামের বাড়ি পাইকপাড়া গ্রামে নয়। তার গ্রামের নাম চরছোন্দা। কিন্তু তিনি একটি নীরব অথচ সফল বিপ্লবের নায়ক। আগে থেকেই আমিরুল ইসলামদের সাংসারিক অবস্থা ভালো। কিন্তু ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় ছোট ৭ ভাইবোনকে মানুষ করার দায়িত্ব পড়ে তার কাঁধে। জায়গা-জমি থাকলেও কৃষিকাজ করা যুবক আমিরুলের একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শৈলকুপা থানা শহরে তাদের একটি বাড়ি আছে। এই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন একজন কৃষি অফিসার। '৮৩-৮৪ সালের কথা। এই অফিসারের সঙ্গে আমিরুলের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমিরুল কৃষি অফিসারের কাছে পরামর্শ চাইতেন কি করা যায়। অফিসার পেঁয়াজের দানার ব্যবসা করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি পেঁয়াজের চারা কোথায় বিক্রি করা যাবে সেসব বিষয়েও কৃষি অফিসার আমিরুলকে সহযোগিতা করেন। আমিরুল ইসলাম বলেন, 'আমার জীবন বদলে যাবার পেছনে ঐ কৃষি অফিসারের অবদান অনেক। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার পরামর্শে আমি '৮৫ সালে ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি থেকে ৫০ কেজি পেঁয়াজের বীজ কিনে আনি। তারপর পাইকপাড়ার ক্যানেলের পাশের কিছু জমিতে বীজ বুনি। অনেক কামলা নিয়ে, প্রচুর পরিশ্রম করে সফলভাবে পেঁয়াজের চারা করতে সক্ষম হই। প্রথমবার সম্ভবত প্রতি বিঘায় ৭৫/৮০ মণ চারা হয়েছিল। প্রথম বছর প্রচুর লাভ হয়। প্রথমবার বীজ কিনেছিলাম ২ হাজার টাকা কেজি। পরেরবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি নিজেই মুড়িকাটা (বীজ) তৈরি করবো। পরেরবার নিজেই বীজ বানালাম। আমার দেখাদেখি অনেকেই পেঁয়াজের চারা করতে আগ্রহী হলো। তাদের কাছে বীজ বিক্রি করলাম। চাষের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম। একই সঙ্গে ৩ একর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করলাম। আমার মনে আছে, প্রথম বছর পেঁয়াজের চারার ব্যবসায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা লাভ হয়েছিল। পরেরবার ১২০০ মণের বেশি পেঁয়াজ পাই। সব মিলিয়ে ২ বছরের মধ্যে পেঁয়াজের চারার ব্যবসা আর নিজ জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন করে বেশ কয়েক লাখ টাকা লাভ হয়। টাকার অঙ্কটা আসলেই '৮৫-৮৬তে অনেক। আমি আরও অনেককে উৎসাহিত করতে লাগলাম। বিশেষ করে পাইকপাড়া গ্রামের মোকাদ্দেস, ইসরায়েলসহ অনেকের কথা বলতে পারি। মোকাদ্দেসের মতো গরিব মানুষ যখন লাখপতি

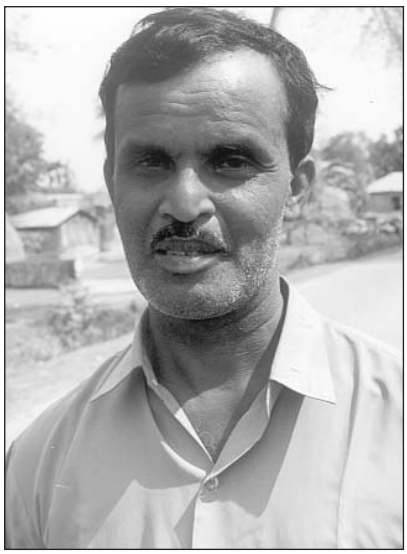

আমিরুল ইসলাম: পইকপাড়া বিপ্লবের নায়ক

হয়ে গেলো, তখন পাইকপাড়ার অন্যান্য মানুষও ধীরে ধীরে পেঁয়াজ চাষে উৎসাহিত হলো। এখন তো ঐ গ্রামের সবাই বাণিজ্যিকভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন করে। পেঁয়াজের চারা আজ আর দূরের কোনো জেলায় নিতে হয় না। জমি থেকেই কৃষকরা নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। ভাবতে ভালো লাগে, আমার দেখানো পথে আজ হাজার খানেক কৃষক প্রতিষ্ঠিত।'

আমিরুল ইসলামের গ্রাম তার দেখানো পথে যায়নি। গেলে কতটা লাভবান হতো তার উদাহরণ পাইকপাড়া গ্রাম আর সেখানকার মানুষ। আমিরুল ইসলামের দেখানো পথে সে নিজে যেমন এলাকার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে পাশাপাশি তার দেখানো পথে অর্থনৈতিকভাবে পুরো একটি গ্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। আমিরুল ইসলাম জানান, তার অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা খুব দ্রুত আশপাশের জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে বড় বড় সব কৃষি বিশেষজ্ঞ আর অফিসাররা তার প্রজেক্ট দেখতে এসেছে। তারা সাহস জুগিয়েছেন। ব্যস এই পর্যন্তই। শুধু পেঁয়াজের চাষ করে আমিরুল ইসলাম ২০ বিঘা জমি কিনেছেন। শৈলকুপা বাজারে বিশাল দুটি মার্কেট করেছেন। ব্যাংকেও প্রচুর টাকা গচ্ছিত। ধারণা করা যায়, সব সম্পদ মিলিয়ে তিনি আজ কোটিপতি।

একটি পাকা রাস্তা

বছর পাঁচেক আগে পাইকপাড়ার মাঝ দিয়ে একটি পাকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটি হবার আগে একজন কৃষকের এক মণ পেঁয়াজ বাজারে নিতে ১০ টাকা খরচ হতো। এখন সেটা ২ টাকায় নেমে এসেছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, একজন কৃষক ইচ্ছা করলে ১০০ মণ পেঁয়াজ একবারে বাজারজাত করতে পারছে। আগে এটা ছিল অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমিরুল ইসলামসহ পাইকপাড়া গ্রামের সবাই রাস্তাটির গুরুত্বের কথা স্বীকার করলেন। আমিরুল ইসলাম বলেন, 'দেশের সব কৃষকের ক্ষেত্রেই একটা সমস্যা হলো পণ্যের বাজারজাতকরণ। আমি প্রথমে এ সমস্যা পদে পদে ফেস করেছি। রাস্তাটি হবার ফলে কৃষক তার পণ্য সহজেই দেশের যেকোনো জায়গায় পাঠাতে পারছে। অন্যদিকে এই রাস্তার ওপর নির্ভর করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমাদের এলাকার লোক এমনিতে পরিশ্রমী। রাস্তা হবার আগে আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হতো। সেটা দূর হয়েছে। তার উপর লাভ বেড়েছে। মোট কথা পাইকপাড়ার মানুষের জীবনযাত্রা বদলে ফেলার পেছনে এই পাকা সড়কটির ভূমিকা অনস্বীকার্য'। মোকাদ্দেস আলী ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আমিরুল আর রাস্তা দুটোই আমাদের জীবন উন্নত করেছে।'

রেকর্ডে আছে বাস্তবে নেই

পাইকপাড়া গ্রামে প্রতিবছর কত পেঁয়াজ উৎপাদন হয়, কত জমি পেঁয়াজ চাষে ব্যবহার হয় এবং এই গ্রামে উৎপাদিত মোট পেঁয়াজের মূল্য কত? এ তথ্য বাস্তবে নেই। যদিও রেকর্ড বইয়ে আছে। জানা যায়, কৃষিতে গ্রামটির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ড্যানিডার সহযোগিতায় একটি প্রজেক্ট নেয়া হয়। প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের পেঁয়াজ চাষে আরও দক্ষ এবং যুগোপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে ৩০ জনের সমবায় একটি গ্রুপ করা হয়। গ্রুপটির প্রধানের নাম ইসরাফিল। প্রজেক্টের মাধ্যমে কৃষকদের কিভাবে পেঁয়াজ সংরক্ষণ, গ্রেডিং করতে হয় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে

প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশাপাশি সার, বীজ দিয়েও সহযোগিতার কথা স্বীকার করেন থানা কৃষি অফিসার মুন্সী মোঃ হেদায়েতুল্লাহ। তিনি বলেন, 'আমি এখানে আসার আগেই প্রজেক্টটি শেষ হয়ে যায়। রেকর্ডে দেখেছি ঐ গ্রামে নারী-পুরুষ উভয়কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।' জানা গেছে, সরকারের কৃষি অফিসাররা গ্রামে খুব একটা আসেন না। তবে ইউনিয়ন ভিত্তিক সুপারভাইজার আছে যাদের দায়িত্ব সরকারের হয়ে কৃষি মনিটরিং করা। গ্রামবাসী জানায় কালেভদ্রে সুপারভাইজারকে তারা দেখেন।

পেঁয়াজ অসম্ভব স্পর্শকাতর ফসল। এটা জন্মানো ও সংরক্ষণ দুটোই অতি সাবধানতার সঙ্গে করতে হয়। নতুবা পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সরকারি রেকর্ডে পাইকপাড়ার কৃষকদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ থাকলেও গ্রামবাসীরা কেউ তা স্বীকার করেনি। মোকাদ্দেস আলী, সুবেদ আলী শেখ, নাসির উদ্দিন বিশ্বাসসহ সবাই বলেন, কই আমরা তো সরকারের কোনো প্রজেক্টের কথা শুনিনি। তবে অনুসন্ধানে জানা যায়, কৃষকদের উন্নয়নের জন্য ড্যানিডার সাহায্য যতটুকু পাইকপাড়ার গেছে তার পুরোটাই ইস্রাফিল খেয়ে ফেলেছে।

পাইকপাড়া পেঁয়াজ চাষে শীর্ষে কিন্তু সেই গ্রামের কোনো পরিসংখ্যান কৃষি বিভাগে নেই। কৃষি অফিসার জানান, আমরা গ্রামভিত্তিক কোনো তথ্য সংগ্রহ করি না, ব্লকভিত্তিক কোনো তথ্য চাইলে বলতে পারবো। তবে সাপ্তাহিক ২০০০ একটা খসড়া হিসাব করে দেখেছে এই গ্রামে প্রতি বছর ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। এখানকার পেঁয়াজ তাহেরপুর প্রজাতির। সরকারের কাছে কোনো তথ্য না থাকলেও কৃষি অফিসার বলেন, 'পাইকপাড়াকে নিয়ে আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা না পেলে কিছু করার নেই। তবে একজন কৃষিবিদ হিসেবে এ রকম সম্ভাবনাময় গ্রামে আমাদের কিছু সাপোর্ট সব সময় থাকে। কারণ এ ধরনের গ্রামে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে, শস্যের বৈচিত্র্যের কারণে পাইকপাড়া গ্রামটি কৃষি বিভাগের জন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।'

ভারতের হাত থেকে বাঁচান

এ বছরটা পাইকাপাড়ার চাষীদের জন্য দুঃস্বপ্নের। শুধু পাইকপাড়া বলা ভুল, পুরো শৈলকুপার ক্ষেত্রেই সত্য। কারণ এ বছর বীজ সংকট। গত বছর শিলাবৃষ্টির কারণে কৃষকের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুরো থানার পেঁয়াজ চাষীরা বীজ সংকটে ভুগেছেন। লাভজনক ফসল হওয়ায় সবাই শীতে পেঁয়াজ চাষ করতে চেয়েছে। কিন্তু কোথাও পর্যাপ্ত বীজ ছিল না। সরকারের কৃষি বিভাগ থেকেও এ ব্যাপারে কৃষকদের সহযোগিতা করা হয়নি। কৃষি

কৃষক পেঁয়াজের বীজ তৈরি করছে নিজ ক্ষেতে

পেঁয়াজের চারা আজ আর দূরের কোনো জেলায় নিতে হয় না। জমি থেকেই কৃষকরা নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়

অফিসার সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছেন, বীজ দেবার মতো মেকানিজম সরকারের কৃষি বিভাগের নাই। বীজ সরবরাহের দায়িত্বে থাকে বিএডিসি নামক একটি প্রতিষ্ঠান। বীজ সংকটের সুযোগ কাজে লাগিয়েছে ফড়িয়ারা। কৃষককে তারা ভারতীয় পেঁয়াজের বীজ সরবরাহ করে। সংকটের কারণে এ বছর ৫০০ টাকার বীজ ২ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। প্রতি কেজি চারা বিক্রি হয় ৫০ টাকা করে। শুধু লাভের আশায় কৃষকরা ২০০০ টাকা কেজি বীজ সংগ্রহ করে। আর যে সব কৃষকের ঘরে বীজ ছিল তারা নিজেরাই সেটা কাজে লাগিয়েছে। ভারতীয় বীজ পাইকাপাড়া বা আমাদের মাটিতে গজায় না। আর রং এক হবার কারণে কোনটা ভারতীয় কোনটা দেশী বীজ চেনা যায় না। হাবিবুর রহমান নামে একজন জানান, 'বীজ বোনার পর দেখি চারা হয়নি। বুঝলাম ভারতীয় বীজ। পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছি। কিন্তু চারাও হয়নি পেঁয়াজও লাগাতে পারিনি। একদম পথে বসে গেছি।' তাইজাল আলী খান নামের অপর আরেকজনও জানালেন, প্রতিবার তারা কয়েকশ' মণ পেঁয়াজ পায়। এবার ভারতীয় বীজের কারণে ঘরে খাওয়ার পেঁয়াজ উঠবে না।

বদলে যাওয়া মানুষ এবং অতঃপর...

পাইকপাড়ার মানুষ নিজেদের ভাগ্য বদলে ফেলেছে। ১৫ বছরে একবার ভারতীয় বীজ তাদের জীবনে সংকট বয়ে এনেছে বলে তারা ভেঙে পড়েনি। দুঃসহ সংকটের মাঝেও কৃষকরা যথাসম্ভব পেঁয়াজ লাগিয়েছেন। যদিও গতবারের তুলনায় সেটা অর্ধেক জমি হবে কিনা সন্দেহ। সংকটের সময় যাদের বীজ ছিল তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অন্যদের সাহায্য করেছে। এ বছর কৃষকরা প্রচুর বীজ উৎপাদন করছে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। অন্যদিকে এ বছর পেঁয়াজের বাজারমূল্য ভাল। কিন্তু কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ নাই। তাতে কি? উত্তর দিলেন, সুবেদ আলী শেখ, '১৫ বছর আমরা পিঁয়াজে সেরা। এক বছর ফেল করলাম। পরেরবার আবার পেঁয়াজ লাগাবো। আমরা চাষ জানি, ফসল ফলতি জানি, সার-ফাসের ব্যবহার জানি। আজি হয়নি কাল হবি। কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সত্যি, তাই বলে বার বার এমন হবি এমন কোন কথা আছে।'

পাইকপাড়াবাসী আজ সাবলম্বী। তারা শুধু নিজেদের কথা ভাবে না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় অন্য চাষীদের কথা ভেবে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় একে অপরের জন্য। এটাই তাদের উঠে দাঁড়াবার মূল শক্তি।

হানাহানি, কাটাকাটি, দুই নেত্রীর ক্ষমতার লড়াইয়ের মাঝে দেশবাসী অসহায়। পাইকপাড়ার মতো গ্রাম আমাদের আশা দেখায় এবং বলে, স্বপ্ন দেখার মতো অনেক কিছুই আছে। পাইকপাড়ার অভিজ্ঞতা বলে বদলে যাওয়া গ্রাম আর বদলে যাওয়া এসব সাধারণ মানুষই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যে সুন্দর বাংলাদেশের কথা আমরা কল্পনা করি, পাইকপাড়া গ্রামটি তো তারই মডেল।

ছবি: **খালেদ সরকার**